মো হি ত রা য়

ভগীরথ এসেছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়

মানুষের নদী তৈরির আধুনিক শিক্ষণীয় আখ্যান

আমরা বেরিয়েছি মৃত্যু উপত্যকার লক্ষ্যে। পরিচিত নাম ডেথ ভ্যালি। সেই নিউ এম্পায়ারে ৬৫ পয়সার আসনে বসে দেখা মরুভূমি, ছোটো-বড়ো পাহাড়, কোথাও জল নেই—হঠাৎ পর্দা জুড়ে উঠে আসে টুপি পরা ঘোড়সওয়ারেরা। পিছনে সেই অবধারিত শিসের গান। তারপর একটা গুলির আওয়াজ, বালির ঝড় আর মাটিতে গড়িয়ে যাওয়া শেষ জলের আধারটি। এই হচ্ছে নেভাদা, অ্যারিজোনা, টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়ার শ'শ মাইল বিস্তৃত মরুভূমি। এরই একটি ডেথ ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক, ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণভাগে। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ছোঁয় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, শীতে জমজমাট ঠান্ডা। সেখানে কোথাও উপত্যকা সমুদ্রতলে কয়েকশো ফুট নীচে, আর পাশেই কয়েক হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। কোথাও নেই কোনো সবুজের ইঙ্গিত, শুধু পাহাড়ের-পর-পাহাড়ে আশ্চর্য সব রঙের পাথর। যেখানে পথের নাম বিশ্বের নির্জনতম পথ।

আমাদের ঘোড়া নেই, চলেছি মোটরগাড়িতে। চালক মানস, অন্য একমাত্র সওয়ারি আমি দর্শক কারণ আমার ইনটারন্যাশানাল ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। ক্যালিফোর্নিয়ার ছোট্ট শহর ফলসম, সান ফ্রানসিস্কো থেকে ১৭৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। সেখান থেকে পাহাড়, জঙ্গল পেরিয়ে আমরা ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্য উপত্যকা পেরিয়ে যাব সেই মৃত্যু উপত্যকায়, পথ পেরোতে হবে ৮০০ কিলোমিটার। মৃত্যু উপত্যকার পথে আমরা প্রবেশ করলাম মধ্য উপত্যকায়। সবুজ কৃষিক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চলে গেছে এদিক-ওদিক প্রশস্ত স্বচ্ছ জলের খাল। উঁচু পথ থেকে সেই দৃশ্য দেখে মনে হল আহা এমন সবুজের

উৎসবের পর কেন আসবে ধুসর মরুভূমি। মানস বলল—এই খালগুলি হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার গঙ্গা। এই মধ্য উপত্যকাও একদিন ছিল প্রায় মরুভূমির মতন। তারপর ভগীরথদের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে গঙ্গা বইল এই উপত্যকায়, সবুজ হল ধরণী। মৃত্যু উপত্যকা যাবার সোজা পথটি বাতিল করে একটু ঘুর পথে গাড়ি নিয়ে তাই চোখ ভরে দেখলাম, জানলাম এই নব-গঙ্গার কাহিনি। বিদেশ ঘুরে এসে সেখানের লেখক শিল্পীদের গল্প-গাথা অনেকেই বলেন কিন্তু শুনি না ভগীরথ-বিশ্বকর্মাদের কথা। বাংলা ভাষায় শিল্প মানে যতদিন আর্ট আর ইন্ডাস্ট্রি দুটোই বোঝাবে ততদিন বাঙালি অনেক সহজ কর্ম আর্টকেই শিল্প বলে প্রাধান্য দেবে। কষ্ট করে আলামোহন দাশ হবার থেকে সত্যজিৎ রায় হবার চেষ্টা অনেক মসৃণ ও সম্মানীয়। (আলামোহন দাশকে কি পাঠকেরা চেনেন? উনি হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রধান স্রষ্টা, হাওড়ার পর দাশনগর রেলস্টেশনটি ওনার নামে।) বরং বাংলায় ইন্ডাস্ট্রিকে বলা হোক প্রশিল্প। (প্রযুক্তি+শিল্প) ও আর্টকে বলা হোক সংশিল্প (সংস্কৃতি+শিল্প)। তাহলে যদি বাঙালির ভ্রম কাটে। যাহোক এবার চলুন মজে যাই ভগীরথের ক্যালিফোর্নীয় আগমন পালায়।

ভারতবর্ষে নদীর আরেক নামই গঙ্গা। যদিও প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র সিন্ধু নদ, সিন্ধু নদের পরিচয়েই ভারতবর্ষের মানুষ প্রথম বহির্বিশ্বে পরিচিত। কিন্তু সিন্ধু তীরের প্রাচীনতম সভ্যতার অনেকটাই কালক্রমে লুপ্ত, এরপর এই অঞ্চল বারবার আক্রান্ত, হয়তো সেজন্যই ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম ধারক হয়ে উঠল আরেক নদী গঙ্গা। ভারতীয়রা ইতিহাস লেখেনি এই চালু কথাটি আমরা নিত্য শুনি কিন্তু ভারতীয়দের লেখা মহাকাব্য, বেদ, উপনিষদ ও পুরাণগুলি ইতিহাস রচনার আরেকরকম প্রকাশ কিনা তা বর্তমান ঐতিহাসিকেরা ভেবে দেখার চেষ্টা করেননি। বিশ্বের প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণ, নায়ক রাম। রামায়ণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতের প্রাণধারা গঙ্গার কথা, বাল্মীকি রচিত রামায়ণের ১০টি সর্গে তা বিবৃত। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রামের পূর্বপুরুষ অযোধ্যার রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সগরের প্রতিপত্তিতে চিন্তিত দেবরাজ ইন্দ্র সেই অশ্ব অপহরণ করে পাতালে লুকিয়ে রাখলেন। সেই অশ্বের খোঁজে বেরোলেন সগরের ষাট হাজার পুত্র, খুঁজতে খুঁজতে পৌছোলেন পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে। সেখানে মুনিকে বিরক্ত করায় তাঁর রোষে ভস্মীভূত হলেন ষাট হাজার পুত্র। স্বর্গে প্রবাহিণী গঙ্গার পুণ্য জলেই এঁরা ভস্মরূপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বর্গগমন করতে পারেন। সগর রাজার বংশধর ভগীরথ তাঁর পূর্বপুরুষের নিষ্কৃতির জন্য দীর্ঘকাল তপস্যা করে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে হিমালয়দুহিতা গঙ্গাকে অবতরণ করালেন মর্ত্যে। শিবের জটার বন্ধন মুক্ত হয়ে হরিদ্বারে নেমে এলেন গঙ্গা—তারপর, 'পশ্চাতে চলেন গঙ্গা ভগীরথ

আগে। মিলিলেন আসি গঙ্গা ত্রিবেণীর ভাগে।।' (কৃত্তিবাস) এর পর মহাকবি বিবরণ দিচ্ছেন কীভাবে গঙ্গা উত্তর ভারতের সমতলভূমি প্লাবিত করে এসে পৌঁছোলেন বাংলায়, সব শেষে সাগরে কপিল মুনির আশ্রমে প্রবেশ করলেন রসাতলে সাগরের পুত্রদের ভস্ম থেকে মুক্ত করতে। কিন্তু একি ষাট হাজার পুত্রের ভস্ম না পুরো উত্তর ভারতের সমতল যা জলের অভাবে শুষ্ক ভস্মসম হয়ে রয়েছে। সেই শুষ্ক পতিত সমতলে ভগীরথ নামক এক জল-প্রযুক্তিবিদ হিমালয়ের হিমপ্রপাতে রুদ্ধ তুষাররাশিকে জলধারায় নিয়ে আসছেন এক বিস্তীর্ণ সমতলে। ভগীরথ খাল কাটতে-কাটতে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর পিছনে সবুজ হয়ে উঠছে প্রান্তর, মানুষ ঘর বাঁধছে, উচ্চারণ করছে সামগান, তৈরি হচ্ছে সভ্যতা।

মানবসভ্যতার ইতিহাস নদী ব্যবহারের ইতিহাস। সিন্ধু, সরস্বতী, নীল, ইউফ্রেটিস, হোয়াং হো নদীতীরেই জ্বলে উঠেছে সভ্যতার প্রথম দীপগুলি। মানুষ নদীকে প্রণাম করেছে আবার তাকে বশে এনে নিজের কাজে লাগানোর প্রচেষ্টায় রত হয়েছে আবহমানকাল। খাল কেটে জল এনে চাষ করেছে, নৌকা-জাহাজ বানিয়ে নদীর বাধাকে করেছে জয়, নদীকে ব্যবহার করেছে বাণিজ্যে, সেতু বানিয়ে নদীকে লাফ দিয়ে পার হয়েছে—যত দিন এগিয়েছে বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষ নদীকে নিজের প্রয়োজন মতো ব্যবহারে আরও সক্ষম হয়েছে। যে নীলনদের প্লাবনের উপর ভরসা করেই পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ, সেই নীল নদকে একদিন সে রুদ্ধ করেছে সুউচ্চ বাঁধে। মিশরের মানুষ এখন আর চাষের জন্য নীল নদের প্লাবনের জন্য অপেক্ষা করে না, সে এখন ইচ্ছেমতন এক নীল নদের জলকে ব্যবহার করতে পারে। ভগীরথের উত্তরপুরুষেরা এভাবেই ভগীরথকে প্রণাম জানায়।

কিন্তু যেখানে নদী নেই সেখানে আবার আসতে হয় ভগীরথকে। ভগীরথ নতুন নদী তৈরি করে নেন। আমরা যাব সেই দেশে যেখানে ভগীরথ ঘুরে গেছেন মাত্র পাঁচ দশক আগেই।

ক্যালিফোর্নিয়া-গোল্ড রাশ থেকে সিলিকন ভ্যালি

সমতলে অবতরণের পর ভগীরথের পিছনে পিছনে গঙ্গা চলেছে উত্তরপ্রদেশ-বিহার-পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে সাগরে। ক্যালিফোর্নিয়াও আয়তনে একেবারে উত্তরপ্রদেশ-বিহার-পশ্চিমবঙ্গের সমান। ক্যালিফোর্নিয়ার আয়তন ৪২৩৯৭০ বর্গ কিলোমিটার, উত্তরপ্রদেশ-বিহার-পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৪২৩৮৪৩ বর্গ কিলোমিটার। দুটোরই মানচিত্রের চেহারাটা একটি প্রায় লম্বাটে আয়তক্ষেত্র। তবে উত্তরপ্রদেশ-বিহার-পশ্চিমঙ্গ

প্রসারিত পশ্চিম থাকে পূর্বে—উত্তরে পাহারায় হিমালয়। ক্যালিফোর্নিয়া প্রসারিত উত্তর থেকে দক্ষিণে—পূর্বে পাহারা সিয়েরা নেভাদা পর্বতমালা আর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। ক্যালিফোর্নিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম প্রদেশ। উত্তর থেকে দক্ষিণে দেড় হাজার কিলোমিটার (কলকাতা থেকে দিল্লি) লম্বা এই রাজ্যের উত্তর আর দক্ষিণের জলবায়ুর তফাত অনেকটাই। ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরে বৃষ্টি ভালোই হয় (১৫০০ মিলিমিটার), উঁচু পাহাড়ে রয়েছে অনেক বরফ গলা জলের হ্রদ। কিন্তু মধ্য আর দক্ষিণে অবস্থা একেবারেই ভিন্ন। মধ্য অঞ্চলে ১৫০-৩০০ মিলিমিটার হলেও একেবারে দক্ষিণে শুধু মরুভূমি। নেভাদা পর্বতের বরফ ঢাকা শৃঙ্গ থেকে নামে কিছু নদী, তা দিয়ে কিছু চাষবাসও হত কিন্তু বৃষ্টি কম হওয়ায় তা ছিল সামান্য। সমুদ্র উপকূল আর নদীর মোহানা অঞ্চলে ছিল আমেরিকার মূলনিবাসী 'রেড ইন্ডিয়ান'দের বাস।

একসময় ক্যালিফোর্নিয়া ছিল স্পেন সাম্রাজ্যের অংশ, তারপর ১৮২১ সালে মেক্সিকো স্বাধীন হলে তা হল মেক্সিকোর অংশ। কয়েক বছর পর ১৮৪৮-এ মেক্সিকো-আমেরিকা যুদ্ধের পর ক্যালিফোর্নিয়া অন্তর্ভুক্ত হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। এসময়েই ক্যালিফোর্নিয়ার ভাগ্য পরিবর্তন হল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। ১৮৩৪ সালে সুইজারল্যান্ডের এক দেউলিয়া ক্যাপ্টেন সাটার সাহেব জাহাজ নোঙর করলেন ইয়ার্বা বুয়েনায়—যার বর্তমান নাম সান ফ্রানসিস্কো। ক্যাপ্টেন সাটার মেক্সিকোর নাগরিক হয়ে জমিজমা কিনে চাষবাস আর কাঠের ব্যবসা শুরু করলেন। পাহাড়ের উপর কাঠ চেরার কল চালাতে স্থানীয় খরস্রোতা 'আমেরিকান রিভার' নদীর জলশক্তি দিয়ে চালাতে শুরু করলেন চেরাই কল। নদীর জল আর পাথর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির সময় লক্ষ করলেন এই নদীর বালিতে রয়েছে সোনা। ১৮৪৮ সালে ২৪ জানুয়ারি দিনটিকেই এই আবিষ্কারের দিন বলে এখন ধরা হয়। এর ক'দিন পরেই মেক্সিকো সরকার এসব না জেনেই ক্যালিফোর্নিয়াকে দিয়ে দেবে আমেরিকাকে। বছর ঘুরতেই সারা দুনিয়া জেনে গেল ক্যালিফোর্নিয়ার সোনা-র কথা, শুরু হল 'গোল্ড রাশ'। নির্জন ক্যালিফোর্নিয়ায় আসতে থাকল দুনিয়ার মানুষ। তখন রেলপথ হয়নি, পানামা খাল হয়নি, মোটরগাড়ি তখন কল্পনাতেও ছিল না—ফলে ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছানো সহজ কথা নয়। দশ হাজার কিলোমিটার দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে চীনারাও জেনে ফেলল সোনার কথা—তারাও এল দলে দলে। বছর চারেকের মধ্যে এই উন্মাদনা শেষ হলেও এর মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবার জন্য চলে এসেছেন হাজার হাজার মানুষ। তৈরি হয়েছে নতুন শহর, জনপদ, ব্যবসা কেন্দ্র, ইয়ার্বা বুয়েনার ছোটো জাহাজঘাটা এখন বড়ো সান ফ্রানসিস্কো বন্দর। আর নদীর সঙ্গে অনাদিকাল বাস করেও ধাতু বিজ্ঞান না আয়ত্ত করায় অন্তরালে চলে গেছে মূল নিবাসী রেড ইন্ডিয়ান মানুষেরা।

বসল নতুন জনপদ, শহর, বন্দর মানে অনেক মানুষ যার প্রয়োজন অনেক জল। সেই জলের বন্দোবস্ত করতে কিছুদিন পর থেকেই শুরু হল নানা রকমের অনুসন্ধান। ভূগর্ভের জলভাণ্ডারের খোঁজ মিলল। গত শতাব্দীর তিনের দশক থেকেই পরিকল্পনা শুরু হল জলের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থার। এরপর ১৯৪৫-এ বিশ্বযুদ্ধের শেষে ক্যালিফোর্নিয়ায় শুরু হল দ্বিতীয় গোল্ড রাশ। এর উপকূলের প্রশান্ত মহাসাগরীয় কবোষ্ণ আবহাওয়া, সান ফ্রানসিস্কো, লস এঞ্জেলস শহরগুলির টান, চলচ্চিত্র শিল্পের কেন্দ্র হলিউড—সব মিলিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় আসতে থাকলেন অনেক মানুষ। ধনী কৃষকরাও বুঝলেন যে জল পাওয়া গেলে এমন পতিত জমিতে সোনা ফলানো যেতে পারে। এর আরও অনেক পরে, একেবারে সাম্প্রতিক কালে ক্যালিফোর্নিয়ায় গড়ে উঠল তথ্য প্রযুক্তির শীর্ষ কেন্দ্র 'সিলিকন ভ্যালি'। এত রকমের কর্মকাণ্ড আর উন্নত কৃষি—এত জলের প্রয়োজন মেটাতে চাই ভগীরথদের।

ভগীরথের সঙ্গে

আমরা এখন চলেছি ভগীরথের সঙ্গে। ফলসম শহর ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী স্যাক্রামেন্টো শহরের কাছেই, সেখান থেকে শুরু আমাদের চলা। ক্যালিফোর্নিয়ার দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী হল স্যাক্রামেন্টো আর সান হোয়াকিন। উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমেছে স্যাক্রামেন্টো নদী আর দক্ষিণ থেকে উত্তরে নেমেছে সান হোয়াকিন—দু'জন মিলেছে স্যাক্রামেন্টো শহরের কাছেই। এখানে তৈরি হয়েছে একটি ছোটো বদ্বীপ অঞ্চল, অনেক ছোটো-বড়ো জলা, নদী ভেঙে অনেকগুলি খাঁড়ি বা মিশেছে সান ফ্রানসিস্কোর পাশে প্রশান্ত মহাসাগরে। এই দুই নদীর উত্তর থেকে দক্ষিণে ছড়ানো ৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ আর ১০০ কিলোমিটার প্রশস্ত অঞ্চল হল স্যাক্রামেন্টো উপত্যকা আর সান হোয়াকিন উপত্যকা—এককথায় বলা হয় সেন্ট্রাল ভ্যালি বা মধ্য উপত্যকা। উত্তরে স্যাক্রামেন্টো উপত্যকায় কিছু বৃষ্টিপাত হয় (৫০০ মিমি) কিন্তু দক্ষিণে সান হোয়াকিন উপত্যকা একেবারেই শুষ্ক। এই শুকনো মরুভূমি-প্রায় মধ্য উপত্যকা কিন্তু একদিন ধীরে ধীরে হয়ে উঠল এক বিস্তীর্ণ সবুজ অঞ্চল। মরুভূমি পালটে গেল আমেরিকার শস্য ভাণ্ডারে। এ সবই হল একটি মাত্র কারণে—সেচ। ভগীরথ এলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়, প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার খাল কেটে, বাঁধ বানিয়ে, জলাধার তৈরি করে মরুভূমিকে করলেন ফসলের প্রান্তর। আমরা এখন সেই ভগীরথের কর্মকাণ্ড দেখতে দেখতে এগোব।

ফলসম থেকে ফলসম নদীর বাঁধ আর আমেরিকান রিভারের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা উঠে এলাম স্যাক্রামেন্টো নদী ধরে, যেখানে রয়েছে একটি বড়ো জলাধার। পুরো মধ্য উপত্যকায় এরকম বাঁধ ও জলাধারের সংখ্যা ৪০ টির বেশি। এরপর আমরা চলব মধ্য উপত্যকা দিয়ে—স্যাক্রামেন্টো উপত্যকা পার হয়ে ঢুকব সান হোয়াকিন উপত্যকায়। নভেম্বরের শুরু, এখন আমেরিকার সর্বত্র 'ফল'-এর অসাধারণ দৃশ্য। গাছের পাতার রং এখন শুধু সবুজ নয় বিভিন্ন রঙের,—লাল, হলুদ, সোনালি, কমলা, বেগুনি, এসবের বিভিন্ন মিশ্রণ। এই যে সারা দেশ, (আমেরিকা মানে মহাদেশ, ভারতের আড়াইগুণ বড়ো) সেখানে এই যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি, সেটিও মুখ্যত মানুষের পরিকল্পিত শিল্প। বিভিন্ন ধরনের ম্যাপল, বার্চ ও আরও অন্যান্য গাছ ও গুল্ম শরতের সময় শীতের পাতা ঝরার আগে তাদের পাতার রং বিভিন্ন রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। এই গাছ ও গুল্মগুলি শহরে, পথের ধারে, বাড়িতে, বাগানে লাগানো হয়, বেশ পরিকল্পনা করেই, ফলে তিন মাস আমেরিকার প্রকৃতি সবুজের একঘেয়া সাজ ছেড়ে সত্যিই রঙিন হয়ে ওঠে। আমরা এই সবুজ রঙিন ছেড়ে এবার নেমে এলাম সান হোয়াকিন উপত্যকায়। আমরা এখন গাড়ি ছোটাচ্ছি এক বিশাল বিস্তীর্ণ সমতলে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সামান্য উঁচুতে। কোথাও কোথাও কিছু ছোটো টিলা আর সুদূর দিগন্তে নেভাদার পাহাড়সারি। এক সময় পুরোটাই ছিল এক তৃণভূমি। এখন কৃষিভূমি। ২৩০ রকমের ফসল ফলে এই মধ্য উপত্যকায়, ফলে দেশের সবচেয়ে ভালো ফল। তাই কোথাও হলুদ ধূসর মাঠের পাশে সেচের জলে সবুজ দ্রাক্ষাবন, কোথাও দিগন্ত জোড়া গম, টমেটো, আপ্রিকট বা তুলোর চাষ। এসবের কারণ ওই মাঠের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এক প্রশস্ত খাল। সিমেন্টে বাঁধানো খালে জল, ঝকঝকে সূর্যালোকে দেখাচ্ছে গাঢ় নীল, কোথাও পথ উঁচুতে উঠলে দেখা যায় আরও কয়েকটি খালের মালা। এই খাল নিয়ে আসছে জল, প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার মানুষের তৈরি নদী ব্যবস্থায় সেচে প্লাবিত ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটার। পৃথিবীর কোনো একটি জায়গাতে এত বড়ো এলাকা জুড়ে জমির ব্যবহারের পরিবর্তনের নজির পাওয়া কষ্টকর। ভগীরথের এই সব কীর্তির সালতামামি একটু জেনে নেওয়া যাক।

ভগীরথের ক্যালিফোর্নিয়ার কাজ শুরু হয় গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। সান হোয়াকিন, স্যাক্রামেন্টো ও কয়েকটি নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করে বরফ গলা আর বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদীর জলধারাকে পরিকল্পনামতো ব্যবহারের সেই শুরু। এর নাম সেন্ট্রাল ভ্যালি প্রোজেক্ট। এর প্রথম বাঁধ ফ্রিয়ান্ট ড্যাম তৈরির কাজ শেষ হয় ১৯৪৪ সালে। এই বাঁধের জলকে খাল কেটে পৌঁছে দেওয়া শুরু হল উপত্যকার

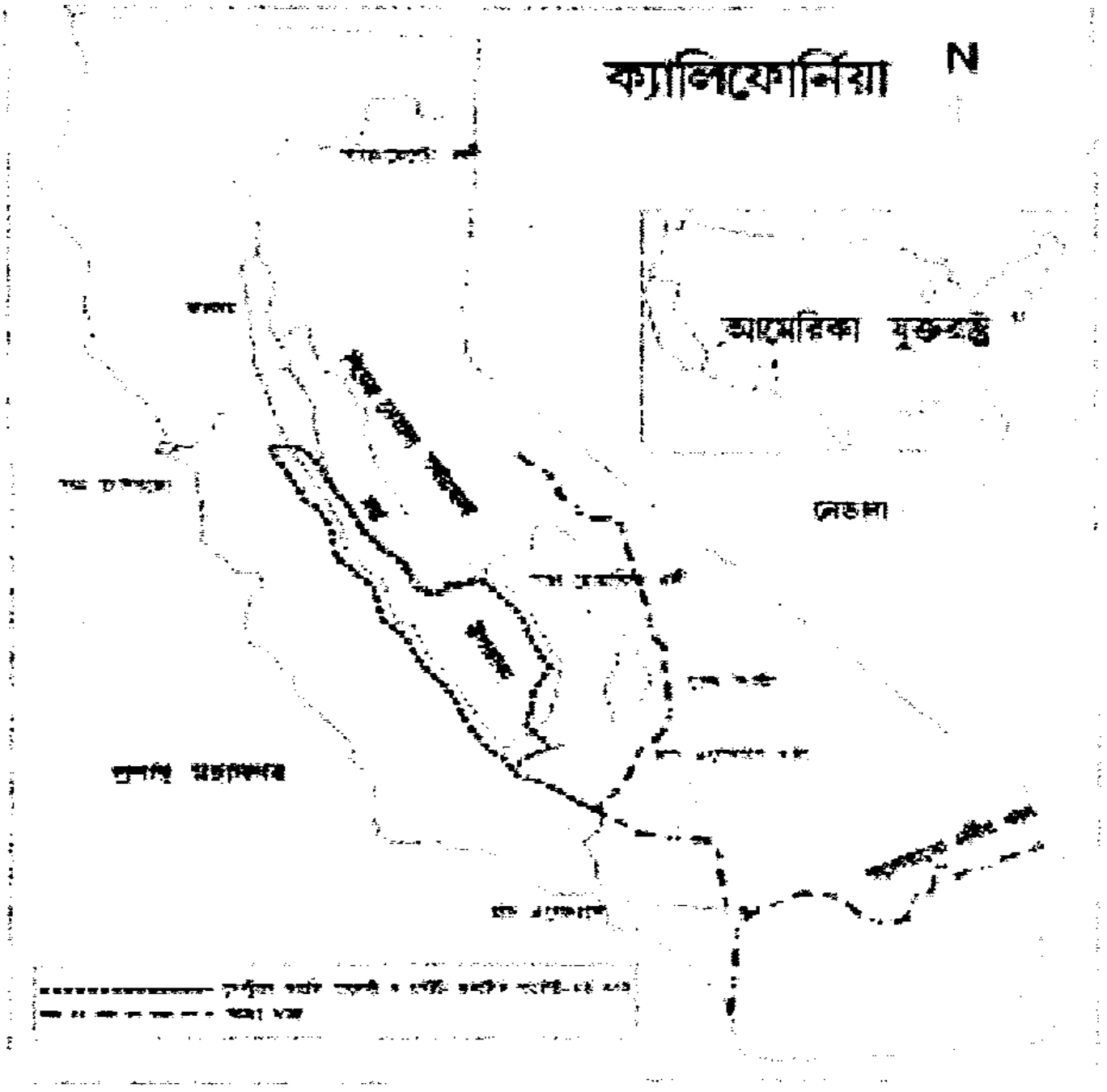

চাষিদের মাঠে—পালটে গেল ক্যালিফোর্নিয়ার জমিচিত্র। শুধু মাঠে নয় জল চাই বেড়ে ওঠা ক্যালিফোর্নিয়ার শহরে শহরে। এরপর তৈরি হতে থাকল আরও বাঁধ, জলাধার। দীর্ঘ সিমেন্টে মোড়া খাল যার দৈর্ঘ্য ৮০০ কিলোমিটার। এখন সেন্ট্রাল ভ্যালি প্রোজেক্ট-এ রয়েছে ২০টি বাঁধ ও জলাধার, শেষ বাঁধ ও জলাধারটি তৈরি হয়েছে ১৯৮২ সালে।

দিনে দিনে ক্যালিফোর্নিয়ার শ্রীবৃদ্ধিতে বাড়ল জলের চাহিদা, মরুভূমিতে কৃষির দারুণ সাফল্যে আরও জমি সেচের অপেক্ষায় রইল। পাঁচ দশক আগে ১৯৬০ সালে তৈরি করা হল এক নতুন প্রকল্প—স্টেট ওয়াটার প্রোজেক্ট। সেন্ট্রাল ভ্যালি প্রোজেক্ট-এর পাশাপাশি স্টেট প্রোজেক্ট আরও বড়ো একটি জল প্রকল্প, আমেরিকায় বৃহত্তম। এরপর

গত ৫০ বছরে স্টেট ওয়াটার প্রোজেক্ট তৈরি করেছে ৩৪টি বাঁধ ও জলাধার, ১২০০ কিলোমিটার খাল। এখন মধ্য উপত্যকা হয়ে উঠল আরও শস্য-পূর্ণ। আমেরিকার চাষের জমির ১ শতাংশ এই মধ্য উপত্যকার কৃষিক্ষেত্র, কিন্তু তার ফসলের পরিমাণ দেশের ৮ শতাংশ। দেশের সবচেয়ে ধনী চাষিরা থাকেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। আর এই প্রকল্পের জল যায় অনেকগুলি শহরে ও শিল্পাঞ্চলে, ক্যালিফোর্নিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এই প্রকল্পের জলের কিছু-না-কিছু সুবিধা ভোগ করেন।

ভগীরথের আরও কিছু কীর্তি দেখা-জানা বাকি ছিল। এতক্ষণে পেরিয়ে এসেছি অনেক পথ। মাঝে মাঝে কিছু ধূসর টিলা, কখনো কিছু ছোটো-বড়ো পাহাড়। গাড়ি মূল পথ ছেড়ে ধরল ছোটো পথ, একেবারে এক খালের গায়ে গায়ে। সে নদীসম প্রশস্ত খালটি ছুটেছে আবার সামনের পাহাড়টির দিকে। নদী নামে পাহাড় থেকে, এ দেখি উলটো পথিক। সামনেই পাহাড়ের সামনে দেখা যাচ্ছে কিছু বাড়িঘর, এই প্রথম চোখে বাড়িঘর পড়ল। সেই নদী পাহাড়ের আগেই থামল এক জলাধারে, তারপর সেই জলাধার থেকে দেখলাম নদী ঢুকে পড়ল বিশালাকায় কয়েকটি পাইপের মধ্যে। পাইপগুলি সেই বাড়িঘরে ঢুকে আবার উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে, একেবারে চলে গেছে পাহাড়ের উপরে। নদী এভাবেই টপকে গেল পাহাড়। নীচে বাড়িঘরগুলি একেকটি বিশাল পাম্পিং স্টেশন। এভাবে এই বিস্তীর্ণ উপত্যকায় অনেক পাহাড় চড়াই পেরিয়ে তারপর আরও দক্ষিণে পাহাড় পেরিয়ে শহরগুলিকে জল সরবরাহ করতে হয়। ফলে দুটি প্রকল্পকেই নদীকে পাম্প করে তোলবার জন্য বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হয়। তবে এই বিদ্যুতের প্রায় সবটাই তারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ভগীরথের এই ইঞ্জিনিয়ারিং মহাযজ্ঞের কর্মকাণ্ড আরও রোমাঞ্চকর যা ঘটে চলেছে অনেক উপরের পাহাড়ে পাহাড়ে।

এই দুটি প্রকল্পের সহজলভ্য দৃশ্য খাল-মাতৃক উপত্যকার নীল জল আর সবুজ ক্ষেতের বিস্তার। কিন্তু নদীর এই জল আসছে পাহাড়ের নদী আর কিছু প্রাকৃতিক হ্রদ থেকে। এই নদীপথ আর হ্রদকে পুনর্নির্মিত করা হয়েছে অনেকগুলি প্রায় ৫০টি বাঁধ আর জলাধার তৈরি করে। এই বাঁধ ও জলাধারগুলি আছে বিভিন্ন উচ্চতায়, সেখান থেকে নিম্নগামী জলের গতিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন করা হয় বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুৎ দিয়েই চলে এই বিপুল জলধারাকে কোথাও পাহাড়ের মাথায় ওঠানো থেকে শহরের ঘরে ঘরে জল সরবরাহ করা। সেন্ট্রাল ভ্যালি প্রোজেক্ট-এর এরকম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে ১০টি, যার সর্ববৃহৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৬৭৬ মেগাওয়াট, সব কেন্দ্রগুলি মিলে ২২২৫ মেগাওয়াট। স্টেট ওয়াটার প্রোজেক্ট-এর আছে ৯টি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২৯৯৯ মেগাওয়াট।

এই খাল, বাঁধ, জলাধার, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বিশাল পাম্পিং স্টেশন সব নির্মিত হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভূকম্পন-প্রবণ অঞ্চলে। ক্যালিফোর্নিয়ার বুকে রয়েছে প্রায় ১০০ টি সক্রিয় ভূকম্পন ফাটল (ফল্ট), বছরে কয়েক হাজার মৃদু ভূকম্প হতেই থাকে সেখানে। প্রতি ২০-২৫ বছরে একটি করে বড়ো মাপের ভূমিকম্প সেখানে হয়ে আসছে। এরকম একটি জায়গায় এই বিশাল নির্মাণ এক ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময়। তেমনি বিস্ময়কর এই প্রকল্পগুলির প্রতিদিনের পরিচালনা। এই দুটি প্রকল্পে যে বিশাল পরিমাণ ব্যয় হয়েছে এবং এটি চালাতেও যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন—তা সবকিছুই কিন্তু মেটানো হচ্ছে চাষিদের, শহরের পুরসভাগুলিকে জল ও বিদ্যুৎ বিক্রি করে। এর পরিচালনার জন্য রয়েছে অনেকগুলি কেন্দ্র সেখানে প্রতি মুহূর্তের জলের পরিমাণ, বিভিন্ন খালে জলপ্রবাহের পরিমাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণের তথ্য জমা হচ্ছে। বিভিন্ন এজেন্সি কতটা জল কিনবেন, বিদ্যুৎ কিনবেন, কখন কিনবেন এইসবের উপর নির্ভর করে জলের দাম, বিদ্যুতের দাম ঠিক হচ্ছে, চলছে বেচাকেনা। ভগীরথের উত্তরসূরিরা মরুভূমিতে গঙ্গা অবতরণ ঘটিয়ে সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং ক্যালিফোর্নিয়া তৈরি করেছে।

সমস্যা অনেক আছে তবুও

এই সব কর্মকাণ্ড কি কোনো সমস্যা ছাড়াই চলছে? একেবারেই নয়। বিশেষত গত দু'বছর ধরে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলছে খরা, তার উপর পরিবেশবাদীদের মামলায় আদালত বলেছে এত জল চাষিদের দেওয়া যাবে না। অনেকরকম পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতির কথাও উঠেছে অনেকদিন ধরেই। সুতরাং সমস্যা আছে। তবে আমাদের ভারতে বছরে পথ দুর্ঘটনায় মারা যায় প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ, গড়ে রোজ প্রায় ৪০০ জন! কেউ কি বলছেন বাস মোটর গাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হোক বা আর নতুন রাস্তা বানাতে হবে না? সুতরাং মাথাব্যথা হলে মাথাটাই কেটে বাদ দেওয়ার দরকার নেই, তবে মাথাব্যথার কারণগুলি খোঁজা দরকার। যেমন স্যাক্রামেন্টো আর সান হোয়াকিন নদীতে বাঁধ দেবার ফলে সেখানে নদী-প্রতিবেশের উপর খুবই ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। সান হোয়াকিন নদী ছিল 'চিনুক স্যালমন' মাছের জন্য বিখ্যাত। এই মাছেরা সেই সাগর থেকে সারা নদী সাঁতরে ডিম পাড়তে আসত পাহাড়ের নীচে নদীর ঠান্ডা জলে।

বাঁধের জন্য নীচের নদীতে জল নেই, সে জল চলে যাচ্ছে খাল দিয়ে। নদী গেছে শুকিয়ে, ফলে সে মাছ উধাও। এসবের জন্য পরিবেশবাদীরা মামলা ঠোকে ১৯৮৮

সালে। ২০০৬ সালে সেই মামলায় বলা হয় যাতে মাছেরা বাঁচে এমন পরিমাণ জল নদীতে ছাড়তেই হবে। এরপর ২০০৭ সালে আরেক রায়। নদী থেকে জল পাম্প করার সময় অনেক মাছ পাম্পে এসে মরে যায়, সেজন্য আদালত রায় দিয়েছে নদীর জল পাম্প করার পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিতে হবে। এ প্রায় এক ভূমিকম্প। একে শুরু হয়েছে খরা তার ওপর জল পাওয়া যাবে কম, কৃষক লবি হইচই ফেলে দিয়েছে সারা দেশ জুড়ে। যেতে যেতে রাস্তার পাশে দেখলাম পরিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে কৃষকদের কড়া পোস্টার।

এসব সমস্যা নিয়ে যে কেউ ভাবছে না তা নয়। যেমন স্টেট ওয়াটার প্রোজেক্ট-এ মাছ বাঁচানোর জন্য অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, ছোটো মাছেদের পাম্পে যাবার আগেই তুলে নিয়ে নীচের নদীতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জল নেবার ও ছাড়াবার সময় জলের তাপমাত্রা দেখে বিভিন্ন গভীরতা থেকে জল নেওয়া হচ্ছে যাতে মাছ ও অন্যান্য জলের প্রাণীদের কোনো ক্ষতি না হয়। এছাড়া শুকিয়ে যাওয়া নদীর অংশকে বাঁচিয়ে তুলতে পরিবেশবাদী ও জলপ্রকল্পের লোকেরা একসঙ্গে কাজ শুরু করেছেন। খরা ও আইনি কারণে খালে কম জলপ্রবাহের ফলে জল সংরক্ষণের উদ্ভাবনী পদক্ষেপ নিচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তরা। যেমন কৃষকরা মাইক্রো স্প্রিনকলিং, ড্রিপ ইরিগেশনে জোর দিচ্ছেন এমনকি লেসার রশ্মির সাহায্যে ক্ষেতের ঢাল সূক্ষ্ম মাপে পরীক্ষা করছেন যাতে জল বেরিয়ে না যায়। অনেক জায়গায় যে-কোনো উদ্বৃত্ত জলকে ভূগর্ভে চালান করে সঞ্চয় করা হচ্ছে। এছাড়া শহরের মানুষদের যথেচ্ছ জলের ব্যবহারে রাশ টানা হচ্ছে। সান হোয়াকিন নদীকে পুনর্জীবন দেবার কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে। অনেকেই মনে করছেন যে বরং এই সমস্যার মোকাবিলায় জল সংরক্ষণেও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্বকে নতুন পথ দেখাবে।

শিবের গীত কেন

দরিদ্র ভারতে বসে ক্যালিফোর্নিয়ার গীত কেন গাইছি? তার কারণ বড়ো সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন বড়ো প্রচেষ্টা। ১২০ কোটি জনসংখ্যার দেশের সব সমস্যাই বৃহৎ, তার মোকাবিলায় প্রয়োজন বৃহৎ কর্মকাণ্ড। ক্যালিফোর্নিয়া তার উদাহরণ। বৃহৎ প্রকল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহসী প্রয়োগ ও সুযোগ্য অর্থনৈতিক পরিচালনা ধূসর বর্তমানকে পালটে দিতে পারে উজ্জ্বল ভবিষ্যতে। আমরাও শুরু করেছিলাম। ভগীরথের গঙ্গার জলকে হরিদ্বারেই রুদ্ধ করে খাল কেটে সেচের জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈরি হয় গঙ্গা ক্যানাল সিস্টেম। হরিদ্বারে এখন যেখানে সবাই পূজা অর্চনা করেন সেটা আদৌ

গঙ্গার মূল ধারা নয় সেটা গঙ্গা থেকে কেটে আনা একটি খাল। ১৮৩৭-৩৮ সালে দুর্ভিক্ষের পর গঙ্গাকে সেচের কাজে ব্যবহারের জন্য এটা প্রয়োজন হয়েছিল। ১৮৪২ সালে যখন এর কাজ শুরু হয় হিন্দু সাধুরা এর প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাতে পিছু হঠেনি। হিন্দুরাও তা মেনে নেন। (অথচ দেড়শো বছর পর আজকে কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণের জন্য একটি সামান্য মসজিদ সরানো সম্ভব হয়নি।) এই খাল কাটার কারণেই হরিদ্বারের কাছেই রুরকিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। আবার ভারতের নদীগুলির ব্যবহারের, তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কথা আলোচিত হচ্ছে, বিতর্কও হচ্ছে। আমাদের ক্যালিফোর্নিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে যথেষ্ট পর্যালোচনা করে বৃহৎ কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করতে হবে। সমস্যা থাকবেই, কিছু ভুল হবেই, তবু আমাদের এগোতেই হবে। ভূমৈব সুখম।